# দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শত্রু

**কমডোর জসীম উদ্দীন ভূঁইয়া (অব.)**
১৩ জুন ২০২৬, ০৭:১০ পিএম

কমডোর জসীম উদ্দীন ভূঁইয়া (অব.)

**ভূমিকা: ইউনেস্কোর কৌতুক এবং কাগজের বাঘ**

সম্প্রতি ইউনেস্কোর একটি চটকদার জরিপ দেখে আমি স্তব্ধ হয়েছি। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ২৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩.৭০% মাস্টার্স ডিগ্রিধারী নিয়ে বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষার হারে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে, যা নাকি আঞ্চলিক নীতিনির্ধারণে আমাদের প্রভাব শক্তিশালী করবে! ভেতরের খবর না জেনে দেওয়া আন্তর্জাতিক সংস্থার এই সার্টিফিকেট যে কতটা অন্তঃসারশূন্য ও হাস্যকর, তা ২০২৫ সালের বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়ের নির্মম আয়নার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে

যায়। সেই বৈশ্বিক সূচকের শীর্ষ ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের ২২টি এবং পাকিস্তানের ৯টি প্রতিষ্ঠান জায়গা পেলেও বাংলাদেশের একটিও নেই। এই বৈপরীত্য আমাদের আসল দেউলিয়াত্ব এবং জাতীয় মননের চরম দারিদ্র্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়।

ইউজিসি ও ব্যানবেইসের সর্বশেষ সরকারি প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে বর্তমানে ৪৭ লাখেরও বেশি টার্শিয়ারি স্তরের শিক্ষার্থী রয়েছে। কাগজে-কলমে এই বিশাল সংখ্যাকে 'দক্ষ জনশক্তি' প্রমাণের অলীক আত্মতৃপ্তি নেওয়া হলেও, আমাদের দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ কেবল দক্ষতাহীন 'সনদপত্র' বিতরণের কারখানায় পরিণত হয়েছে; আর এই "দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়ই আজ দেশের আসল শত্রু"। অতি সম্প্রতি বিশিষ্ট লেখক রিন্টু আনোয়ার তাঁর "উচ্চশিক্ষায় নিম্নমানের কাণ্ডকীর্তি" নিবন্ধে এই নগ্ন রূপটি উন্মোচন করেছেন। আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠন-পাঠন ও গবেষণার অবসান ঘটিয়ে, অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার চেয়ে দলীয় আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষকেরা দেশের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এই ধ্বংসযজ্ঞ রুখতে এবং সুস্থ অ্যাকাডেমিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শিক্ষকদের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

**পটভূমি: কেন আমি এই নিবন্ধটি লিখতে বাধ্য হলাম?**

এই নিবন্ধটি কোনো সস্তা সমালোচকের দূরবর্তী বিলাপ নয়, বরং উচ্চশিক্ষার গভীরে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জাতীয় দায়বদ্ধতা থেকে কলম ধরা। দেশের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস' (BUP) প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত বিশেষ 'ট্রাই-সার্ভিস কমিটি'-র একজন অগ্রগামী (Pioneer) সদস্য হিসেবে এর খসড়া পরিকল্পনা, আইন পাস ও শিক্ষাপদ্ধতি দাঁড় করাতে আমি নিবিড়ভাবে কাজ করেছি। পরবর্তীতে এখানে প্রায় ৪ বছর সার্বিক দায়িত্ব পালনকালে প্রত্যক্ষ করেছি কীভাবে সততা, সামরিক শৃঙ্খলা ও সঠিক দূরদর্শিতা একটি প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে পারে। তাই সস্তা প্রশংসার আড়ালে আমাদের মূল ধারার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন মেরুদণ্ডহীন ও অকার্যকর হয়ে পড়ছে, তখন একজন শিক্ষানুরাগী এবং দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে আমি চুপ থাকতে পারি না। কারণ এই দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই আজ দেশের প্রচ্ছন্ন শত্রু; আর এই নিবন্ধটি আমাদের নীতিনির্ধারকদের ঘুম ভাঙানোর এক তীব্র আর্তনাদ।

**১. নৌবাহিনীর শিক্ষা: জাহাজের প্রধান শত্রুএবং জীবনরক্ষার প্রথম পাঠ**

নৌবাহিনীর দীর্ঘ চাকুরিজীবনে আমাদের একটি অত্যন্ত মৌলিক জীবনমুখী শিক্ষা দেওয়া হয়, 'জাহাজের আসল শত্রু কে?' একটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ মানেই প্রযুক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, সংবেদনশীল ওয়্যারিং এবং ধ্বংসাত্মক গোলাবারুদে ঠাসা এক নিশ্ছিদ্র অস্ত্রাগার। একই সাথে সেখানে নাবিকদের তিনবেলার খাবারের জন্য রয়েছে বিশাল রান্নার ব্যবস্থা (Heavy kitchen)। এই কমপ্যাক্ট পরিবেশে জাহাজের এক নম্বর শত্রু কোনো বহিঃশত্রুর মিসাইল নয়; জাহাজের প্রধান শত্রু হলো 'আগুন' (Fire)। আর এই কারণেই বিশ্বের সমস্ত নৌবাহিনীর জাহাজে প্রতিদিন বিকেলে বাধ্যতামূলকভাবে 'ফায়ার ফাইটিং ড্রিল' বা আগুন নেভানোর মহড়া করা হয়। কারণ, জাহাজে একবার আগুন লাগলে এবং তা সময়মতো নেভানো না গেলে জাহাজটি আস্তে আস্তে কাত হয়ে মাঝসমুদ্রেই ডুবে যায়। তাই টিকে থাকার প্রথম পাঠ হিসেবে এই এক নম্বর শত্রুকে চেনা এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা শেখানো হয়। শত্রু না চিনলে, যুদ্ধ জয়ের আগেই নিজের জাহাজ কয়লা হয়ে তলিয়ে যাবে।

## ২. উচ্চশিক্ষার অন্দরমহল: শত্রুনা চেনার খেসারত এবং একটি প্রজন্মের জীবন্ত দহন

নৌবাহিনীর ফায়ার ফাইটিং দর্শনের সাথে আমাদের উচ্চশিক্ষার হুবহু মিল রয়েছে। জীবনের মূল্যবান ৫-৬টি বছর ও অর্থ বিনিয়োগের পরও যখন লক্ষ লক্ষ তরুণ কর্মসংস্থান পায় না, তখন সেই শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতীয় বিপর্যয়। আজ শুধু সামাজিক মর্যাদার লোভে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে এবং পরিশ্রম ছাড়াই সহজে সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে। জাহাজের আগুনের মতোই এই সস্তা সার্টিফিকেট, মানহীন পরীক্ষা, রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি এবং জবাবদিহিতাহীন শিক্ষকেরা হলেন আমাদের উচ্চশিক্ষার "এক নম্বর শত্রু"। এই অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে এখনই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা না নিলে আমাদের অর্থনীতি ছারখার হয়ে যাবে, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের অপমৃত্যু ঘটবে এবং যুবসমাজের নৈতিক পতন ও সামাজিক ব্যাধি দাবানলের মতো পুরো দেশকে গ্রাস করবে।

## ৩. উচ্চশিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিকীকরণ: নীতিনির্ধারকদের হঠকারিতা বনাম ব্যবসায়ীদের মনস্তত্ত্ব

একটি মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা মেধাবীদের জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত, যারা গবেষণা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড দেবে। কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেছে উল্টো; ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন

দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশের মালিক চতুর ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি, যাদের কাছে শিক্ষা ট্যাক্স-ফ্রি মুনাফা অর্জনের বাণিজ্যিক হাতিয়ার। ন্যূনতম মান ছাড়াই এখানে কোটি কোটি টাকায় সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে। এমনকি বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের জন্য নামমাত্র 'নৈশকালীন কোর্স' চালিয়ে মৌলিক জ্ঞানহীন শিক্ষার্থীদের হাতে টাকার বিনিময়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি তুলে দিচ্ছে, যা শিক্ষার নামে চরম জালিয়াতি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিগত সরকারগুলোর সস্তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, "প্রতি জেলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়"। উচ্চশিক্ষাকে এভাবে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক পণ্যে পরিণত করায় এবং যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় ডিগ্রির মান আজ সম্পূর্ণ তলানিতে ঠেকেছে।

**৪. ট্রাস্টি বোর্ডের বাণিজ্যিকীকরণ বনাম মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা: প্রাতিষ্ঠানিক লোভের নির্মম রূপ**

আমাদের উচ্চশিক্ষা আজ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির করাল গ্রাসে মুক্ত নয়, যার নগ্ন রূপ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের বাণিজ্যিকীকরণ। আইন অনুযায়ী এগুলো ‘অলাভজনক’ হওয়ার কথা থাকলেও আজ তা স্রেফ ‘সনদবাণিজ্যের’ করপোরেট প্রতিষ্ঠান, যেখানে উপাচার্যরা ক্ষমতাহীন পুতুল মাত্র। স্বনামধন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে ৩০৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিলাসবহুল গাড়ি কেনার মামলা বিচারাধীন এবং আরেকটি প্রতিষ্ঠানের জমি কেনা কেলেঙ্কারি ও ৪৪৫ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম নিয়ে দুদক তদন্ত করছে। এই লোলুপতার কারণে তৈরি হওয়া "দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয় আজ দেশের এক প্রচ্ছন্ন শত্রু'।

এই দেউলিয়াত্বের বিপরীতে মানসম্মত শিক্ষার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ইউজিসির HEQEP প্রকল্প শুরু হলে, বিইউপির প্রতিনিধি হিসেবে আমার টিমসহ আমি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাজহারুল ইসলামের যোগ্য সুপারভিশনে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিই। সেই জ্ঞান ও সামরিক শৃঙ্খলাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিইউপির শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার যে বলিষ্ঠ ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম, পরবর্তী উত্তরসূরিদের নিরলস প্রচেষ্টায় তা আরও বেগবান হয়েছে; যার সুফলস্বরূপ আজ বিইউপির গ্র্যাজুয়েটরা দেশের শীর্ষস্থানীয় ও সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো লুফে নিচ্ছে।

পরবর্তীতে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (BAC) প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. এস এম কবির এবং তাঁর বিজ্ঞ টিমের অধীনে বেশ কয়েকটি ফেজে উচ্চতর অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণ নিই। সেই জ্ঞান এবং বিইউপি ও সামরিক জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC সেলের পরিচালক হিসেবে শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক মানের ওবিই (OBE) পাঠদান পদ্ধতিতে অভ্যস্তকরণে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং একটি 'সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম' চালু করার চেষ্টা করি। কিন্তু ট্রাস্টি বোর্ড শিক্ষার মানের চেয়ে মুনাফাকে প্রাধান্য দেওয়ায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পাইনি। এই গুণগত কাজের ভিত্তিতে আমাকে উপাচার্য পদের প্রস্তাব দেওয়া হলেও, ট্রাস্টি বোর্ডের প্রভাব ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা আমার নীতি-আদর্শের পরিপন্থী হওয়ায় আমি তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করি। শিক্ষাঙ্গনে ব্যবসায়িক অর্থলিপ্সা আজ দেশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করছে।

**৫. শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলার চরম অবক্ষয় ও দুর্নীতি: উপাচার্য ও শিক্ষকদের দলীয় কোন্দল**

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে আজ শিক্ষা ও গবেষণার পরিবর্তে ঘুষ, অন্ধ দলীয় আনুগত্য এবং আত্মীয়তাবাদের একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বিগত সরকারের সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘দুই কোটি টাকায় উপাচার্য পদ বিক্রি’র খবর দেশজুড়ে

তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে শিক্ষক নিয়োগেও এখন মেধা নয়, 'পার্টিলাইন' বা দলীয় আনুগত্যই যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড। এই নির্মম বাস্তবতা উচ্চশিক্ষাকে একটি সস্তা 'ডিগ্রির বাজারে' পরিণত করেছে।

আজ ক্যাম্পাসগুলোতে বিশৃঙ্খলা ও পচনের মূলে রয়েছেন খোদ উপাচার্য ও শিক্ষকেরা। লেখক রিন্টু আনোয়ারের ভাষায়, একে শুধু 'অরাজকতা' বললে ভুল হবে, এর চেয়েও জঘন্য ও নিকৃষ্ট ক্রিয়াকলাপ ঘটছে দেশের উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে, যেখানে পঠন-পাঠনের চেয়ে মিছিল, মিটিং, ঘেরাও আর শাটডাউন বেশি প্রাসঙ্গিক। যেমন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদোন্নতির দাবিতে শিক্ষকেরা নিজেই প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং পরবর্তীতে সেই তালা ভাঙার নোংরা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেন স্বয়ং উপাচার্য মোহাম্মদ তৌফিক আলম! একইভাবে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিবিরোধী আন্দোলনের জেরে শিক্ষকদের ওপর বহিরাগতদের হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হন এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির সাথে শিক্ষকদের হাতাহাতির মতো লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে।

উপাচার্যদের এই অ্যাকাডেমিক দেউলিয়াত্ব ও সস্তা জনপ্রিয়তার লোভ আজ উচ্চশিক্ষাকে এক নিম্নমানের তামাশার গহ্বরে পতিত করেছে। গবেষণা কিংবা শিক্ষার বৈশ্বিক মান নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা হারিয়ে খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক উপাচার্য গণমাধ্যমের সামনে গর্ব করে বলেছিলেন, "১০ টাকায় এক কাপ চা, একটি সিঙ্গাড়া, একটি সমুচা এবং একটি আলুর চপ পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ও ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটি জানতে পারলে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পাবে!" যে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের উপাচার্যরা বিশ্বমঞ্চে গবেষণার খতিয়ান তুলে ধরার পরিবর্তে ১০ টাকার চা-সিঙ্গাড়া নিয়ে গিনেস বুকের স্বপ্ন দেখেন, তাদের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচন ধরবে, এটাই স্বাভাবিক।

ইউজিসির ঠুঁটো জগন্নাথ মার্কা ভূমিকা এবং উপাচার্যদের পদ বিক্রি, সস্তা ভাঁড়ামো ও নোংরা দলবাজির কারণে যেখানে শিক্ষকেরা নিজেই শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে এমন জঘন্য কর্মকাণ্ড ও মূর্খতায় লিপ্ত,, সেখানে কোনো দক্ষ নাগরিক তৈরি হওয়া অসম্ভব। এই মেরুদণ্ডহীন ও "দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই আজ দেশের আসল শত্রু"।

**৬. মেধার জীবন্ত কবর: লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি বনাম একটি প্রজন্মের সামাজিক অবক্ষয়**

বিশ্ববিদ্যালয় মানেই নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও গবেষণার পবিত্র পীঠস্থান। অথচ বাংলাদেশের নির্মম বাস্তবতা হলো, এখানে গবেষণার সংস্কৃতিকে সমাহিত করে কেবল সস্তা 'সার্টিফিকেট' বিতরণকেই একমাত্র লক্ষ্য বানানো হয়েছে। বিবিএস ও বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, দেশে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব প্রায় ২৭.৮ শতাংশ! প্রতি ৩ জনে একজন গ্র্যাজুয়েট পাস করার পর টানা দুই বছর সম্পূর্ণ বেকার বসে থাকে। এই পরিসংখ্যান লাখ লাখ পরিবারের কান্না এবং একটি প্রজন্মের মেধার জীবন্ত কবর।

এই পচনের মূল কারণ লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের সেই নৃশংস ঘটনা পুরো দেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। বিগত আমলগুলোতে ছাত্রনেতারা অধিকারের রাজনীতি ভুলে অস্ত্রধারী বডিগার্ড ও পাজেরো গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাসে দাপিয়ে বেড়াত। এর করাল গ্রাসে শিক্ষকেরাও নিজেদের পদোন্নতি বা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এই রাজনৈতিক ক্যাডারদের কাছে জিম্মি থাকতে বাধ্য হন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ দেশপ্রেমিক নাগরিক নয়, বরং ভবিষ্যৎ দুর্নীতিবাজ নেতা তৈরির প্রজনন কেন্দ্রে (breeding ground) পরিণত হয়েছে। এই মেরুদণ্ডহীন ও "দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই আজ দেশের আসল শত্রু"।

এই নোংরা রাজনৈতিক খেলার বিপরীতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP) আজ অনন্য, কারণ বিইউপি সম্পূর্ণভাবে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি থেকে মুক্ত। ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ফরিদ আহমদ সোবহানীর সম্প্রতি লেখা “হোয়াট আই স ইন ম্যান্ডেলাস কান্ট্রি” শীর্ষক চমৎকার নিবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি, নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় মাত্র ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং সেগুলো সম্পূর্ণভাবে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। একজন উপাচার্যের এই বাস্তব পর্যবেক্ষণটি আমাদের চোখ খুলে দেয়। দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির সময় আজ চূড়ান্তভাবে শেষ; এখন আমাদের মূল মনোযোগ হতে হবে কেবলই দক্ষতা উন্নয়ন (Skill development), যা আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ করবে।

### ৭. ঐতিহাসিক সংকট: শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও নেতৃত্বের পুনর্জাগরণ

এই কাঠামোগত পচন ও নৈতিক দেউলিয়াত্ব আমাদের কোনো আকস্মিক সংকট নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্থবিরতার অংশ, যা নিয়ে আমি আমার গ্রন্থ “জাতীয় দিশা”-য় অন্তর্ভুক্ত “বাঙালি কেন ৬৩ বছর পিছিয়ে: শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও নেতৃত্বের পুনর্জাগরণ” শীর্ষক অধ্যায়ে অত্যন্ত বিস্তারিত ও গভীরভাবে আলোকপাত করেছি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ চরিত্রগঠন, গভীর আত্মশুদ্ধি (Self-purification) এবং দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব তৈরির বুনিয়াদি দর্শন শেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষমতার রাজনীতির কাছে বন্ধক রেখেছি। পিছিয়ে থাকার এই ৬৩ বছরের গ্লানি মুছতে হলে এবং ঐতিহাসিক বিপর্যয় থেকে বাঁচতে হলে, উচ্চশিক্ষার খোলনলচে বদলে ফেলে চরিত্র, নৈতিকতা ও দক্ষতার এক নতুন বিপ্লব সূচনা করতে হবে।

### ৮. সমাধান ও রূপরেখা: উচ্চশিক্ষা সংকোচন, চীনের সাথে জাতীয় চুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষার বিপ্লব

এই ভয়াবহ জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের এখনই একটি বৈপ্লবিক ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথমত, আমাদের ঢালাওভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তি অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। উচ্চশিক্ষা সবার জন্য নয়; এটি কেবলই তীব্র প্রতিভাসম্পন্ন এবং প্রকৃত মেধাবীদের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। মানহীন ও "দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শত্রু" তৈরি করা ছাড়া দেশকে কিছুই দিতে পারে না।

আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনের দিকে তাকাই, তবে দেখব তারা এই সংকটকে কতটা কঠোর ও দূরদর্শিতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করেছে। চীনে উচ্চশিক্ষার প্রাথমিক ধাপেই একটি কঠোর ছাঁটাই প্রক্রিয়া রয়েছে। তারা ঢালাওভাবে সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার সুযোগ দেয় না। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়েই বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নিয়োজিত করে। যার ফলশ্রুতিতে চীনের তরুণ সমাজ বেকারত্বের বোঝা না হয়ে, সরাসরি দেশের উৎপাদনশীল শিল্প খাতের দক্ষ চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। সম্প্রতি চীনের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) অ্যাপ ‘ডিপসিক’ (DeepSeek) পুরো বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। অত্যন্ত কম খরচে তৈরি এই বৈপ্লবিক এআই প্রযুক্তির প্রবক্তা হলেন ৪০ বছর বয়সী লিয়াং ওয়েনফেং, যিনি চীনের ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র। লিয়াং তাঁর এই অসাধ্য সাধনের জন্য চীনের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সেরা সেরা গবেষক ও কারিগরি কর্মীদের বাছাই করেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই কারিগরি বিপ্লব কীভাবে সফল করা সম্ভব, তার একটি সফল বাস্তব উদাহরণ আমাদের নিজেদের দেশেই রয়েছে। ২০০৯ সালে আমি যখন বাংলাদেশ নেভি ডকইয়ার্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম,

তখন আমার হাত করেই "বাংলাদেশ নেভি ডকইয়ার্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট" (BNDTI)-এর কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের এক ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। ডকইয়ার্ডের এই টেকনিক্যাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও গুণগত মান এতটাই উচ্চপর্যায়ের ছিল যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও (ILO) কারিগরি শিক্ষার একদল শিক্ষার্থী বা ব্যাচের সম্পূর্ণ অর্থায়ন করেছিল, যাতে তারা বাংলাদেশ নেভি ডকইয়ার্ডের CSTI থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক (Trainer) হিসেবে অবদান রাখতে পারে। একইভাবে, এই শিক্ষার অনন্য মান ও যোগ্যতার কারণে বিশ্বব্যাংকও (World Bank) শিক্ষার্থীদের ৬টিব্যাচের প্রশিক্ষণের জন্য সরাসরি অর্থায়ন করেছিল। নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ডের এই সফল ও ফলপ্রসূ মডেলটি প্রমাণ করে যে, তাত্ত্বিক সার্টিফিকেটের পেছনে না ছুটে যুবসমাজকে যদি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে হাতে-কলমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা কোনো কঠিন বিষয় নয়।

তাই বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে রাষ্ট্রীয় বাজেট কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে ডাইভার্ট করতে হবে। এই লক্ষ্যে আমি কানাডার বিখ্যাত SIAST (Saskatchewan Polytechnic)-এর সহযোগিতা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম; প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা দক্ষ পেশাদার টিম আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাগত লক্ষ্য পূরণে সরাসরি সহায়তার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমি ডকইয়ার্ড ত্যাগ করার পর সেই উদ্যোগ আর এগোয়নি। এখনও সময় আছে, চীন আজ প্রযুক্তিতে বিশ্বনেতা। তাদের সেই সুখ্যাত "বিশেষ চিনা মস্তিষ্ক" (Especial Chinese Brain) ও কারিগরি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাদের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় নীতি কাঠামো তৈরি করতে হবে, যা মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে দেশব্যাপী হাজার হাজার বিশ্বমানের টেকনিক্যাল সেন্টার গড়ে তুলবে।

**৯. সময়ের অপচয় বনাম মিসাইলডিফেন্স: জাতীয় স্তব্ধতা ও বাস্তবায়নের ট্র্যাজেডি**

সতেরো শতকের বিখ্যাত একটি দার্শনিক প্রবাদ রয়েছে, “পৃথিবীতে মানুষ তিন প্রকার: জীবিত, মৃত এবং যারা সমুদ্রে রয়েছে।” এই উক্তিটি নৌবাহিনীর নাবিক ও অফিসারদের জীবনকে নিখুঁতভাবে ধারণ করে। কারণ, সমুদ্রে থাকা মানুষগুলো প্রতিনিয়ত জীবন ও মৃত্যুর এক ধূসর সীমানায় বাস করে। শান্তিকালীন সময়ে টাইফুন, প্রলয়ঙ্করী ঝড় কিংবা সাইক্লোনের মতো প্রকৃতির রুদ্র রূপের বিরুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই, আর যুদ্ধকালীন সময়ে ধেয়ে আসা শত্রুর গোলার মুখে বুক পেতে দেওয়া, তাদের প্রতিটি মুহূর্তই টিকে থাকার চরম সংগ্রাম।

একজন নৌ অফিসার হিসেবে আমি জানি, যুদ্ধজাহাজে ধেয়ে আসা একটি শত্রুমিসাইল ঠেকাতে আমাদের সেকেন্ডের হিসাব করতে হয়। সেখানে সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা (Timely action) না নিলে পুরো ক্রুসহ জাহাজ নিমেষেই ধ্বংস হয়ে যাবে, যা সাম্প্রতিক ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ থেকেও অনুমেয়। সামরিক কৌশলে যেখানে 'টাইম ম্যানেজমেন্ট' মানে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান, সেখানে আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বছরের পর বছর সেশনজট ও আমলাতান্ত্রিক মন্থরতা আমাদের গ্রাস করছে। মানহীন ও "দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয় যে দেশের শত্রু", তা এই দীর্ঘসূত্রিতা দেখলেই স্পষ্ট হয়।

একটি ছোট্ট বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। দেশের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের মূল প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ২০০৬ সালে। এর প্রাথমিক খসড়া অনুমোদন পেতেই কেটে গেল ৬ বছর (২০১২)। এরপর আইন পাস হয়ে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) গঠিত হলো ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে।

কাউন্সিলের প্রথম প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হতে সময় লাগল আরও দুই বছর (২০inf সালের ডিসেম্বর)। অবশেষে ২০২২ সালের জুনে তারা প্রথম অফিসিয়াল 'অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল' প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল্যায়ন শুরু করে।

যে দেশে সেকেন্ডের ভুলে যুদ্ধজাহাজ ডুবে যেতে পারে, সেখানে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল কাউন্সিল কার্যকর করতেই আমরা ১৬ বছর (২০০৬-২০২২) অপচয় করেছি! বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬০টিরও বেশি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অনেক ডিগ্রি প্রোগ্রাম চলমান। এই বিশাল প্রোগ্রামকে মূল্যায়ন করা যে কত দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, তা সহজেই অনুমেয়। ধেয়ে আসা মিসাইলের মতোই এই শিক্ষাগত স্থবিরতা আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করার আগেই যদি আমরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সময়োপযোগী ব্যবস্থা না নিই, তবে পুরো জাতির অচিরেই সলিলসমাধি ঘটবে।

**শেষ কথা**

২৭.৮% উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের ভয়ংকর হার মাথায় নিয়ে ইউনেস্কোর চটকদার সার্টিফিকেটের অলীক মোহে অন্ধ থাকার সুযোগ নেই। মানহীন ডিগ্রিধারী তৈরি করে সমাজকে অপরাধের অভয়ারণ্য বানানোর এই আত্মঘাতী খেলা বন্ধ করার এখনই শেষ সময়। কারণ মেধা ও দক্ষতাহীন এই "দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত দেশের সুপ্ত শত্রু"।

আমাদের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী অত্যন্ত প্রো-অ্যাক্টিভ। তবে আমাদের মূল সংকট সুন্দর পরিকল্পনার অভাব নয়, বরং তা বাস্তবায়নের সদিচ্ছা। দীর্ঘদিনের এই বাস্তবায়ন-হীনতার সংস্কৃতি ভেঙে এবার মন্ত্রণালয়কে দ্রুত ও সরাসরি অ্যাকশনে নামতে হবে। ট্রাস্টি বোর্ডের অশুভ প্রভাব ও উপাচার্য পদের প্রশাসনিক বিচ্যুতি কঠোর হস্তে দমন করার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে কাগজে-কলমে অগ্রাধিকার না রেখে বাস্তবভিত্তিক রূপ দিতে হবে। চীনের কারিগরি মডেল অনুসরণ করে যুবশক্তিকে সরাসরি দক্ষ করে তোলার মাধ্যমেই কেবল একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ জয় করে একটি মেধাভিত্তিক অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব, ইনশাআল্লাহ।

**লেখক:** সাবেক সহকারী নৌবাহিনী প্রধান ও উপ-উপাচার্য, বিইউপি

**ইমেইল:** carbhuiyan@gmail.com